আমাদের প্রতিদিনের শব্দ

আবদুল হাই শিকদার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ঠিক ভূমিকা নয়

মনন এবং সৃজনে বঙ্গীয় মনীষার এক শিখড়স্পর্শী নাম সৈয়দ আলী আহসান। গবেষণায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও অতিক্রম করে গেছেন। আর তাঁর কবিতা বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা অসমাপ্ত।

শুধু রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে কবি ফররুখ আহমদের পরে এই মুক্তিযোদ্ধা কবি ও মনীষাকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। যেভাবে কবি আল মাহমুদকে সহ্য করতে হয়েছে ফ্যাসিবাদের আক্রমণ।

আমার এই বইটি বাচাল সাহিত্য-সমালোচক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বুদ্ধিজীবীদের নানা তৎপরতার বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণের প্রয়াসমাত্র। আমার লক্ষ্য রাজনৈতিক কোলাহলের বাইরে যে শান্ত স্থির পৃথিবী, তার সবুজে অবগাহন। সেই কারণে বইয়ের নামটিও নেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' থেকে, যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমি শুধু 'আমার' স্থলে 'আমাদের' কথাটি বসিয়েছি।

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে আমার অনেক কৃতজ্ঞতা। আর ধন্যবাদ জানাই তরুণ তুর্কি ফয়সাল আহমেদকে।

আবদুল হাই শিকদার
জাতীয় প্রেসক্লাব
ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

সূচিপত্র

শেষ যাত্রার পথের ধুলোয়	১১
অনন্তের কল্যাণ প্রবাহ	২৩
আমাদের প্রতিদিনের শব্দ	৩০
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	৩৬
কোনো দিন ভুলব না	৩৯

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-০১ :	আমার কবিতার স্বভাব।	৪৩
পরিশিষ্ট-০২ :	আবুল মনসুর আহমদ	৪৮
পরিশিষ্ট-০৩ :	সিরাজদৌল্লা স্বাধীনতার প্রতীক	৫২
পরিশিষ্ট-০৪ :	উপঢৌকন	৫৫
পরিশিষ্ট-০৫ :	শেষ চিঠি	৬১
পরিশিষ্ট-০৬ :	সৈয়দ আলী আহসান : ঐতিহ্য যুগ ও জীবন-প্রেরণা/ রাবেয়া মঈন	৬৪
পরিশিষ্ট-০৭ :	অনেক রাত্রে গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো/আবদুল মান্নান সৈয়দ	৮৫
পরিশিষ্ট-০৮ :	সৈয়দ আলী আহসান স্মরণে/আল মাহমুদ	৯১
পরিশিষ্ট-০৯ :	সম্পর্কের সূত্র ধরে/মাহমুদ শাহ কোরেশী	৯৫
পরিশিষ্ট-১০ :	সাক্ষাৎকার—মাদরাসা শিক্ষা হচ্ছে মৌলিক আদর্শগত শিক্ষা	১০০
পরিশিষ্ট-১১ :	সাক্ষাৎকার—ধর্ম মানবিক সমতার উৎস	১০৫

পরিশিষ্ট-১২ : কথোপকথন—কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে ১২১
পরিশিষ্ট-১৩ : সৈয়দ আলী আহসান : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি ১২৪

সংযুক্তি

সংযুক্তি-০১ : আমার পূর্ব বাংলা ১৩২
সংযুক্তি-০২ : সৈয়দ আলী আহসান স্মরণ জাতীয় কমিটি ১৩৪

শেষ যাত্রার পথের ধুলায়

এক

বাইরে তিমির নিবিড় রাত। বাইরে গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দ। বাইরে গুচ্ছ গুচ্ছ স্নিগ্ধ তমাল অন্ধকারের। বাইরে মত্ত বাতাসের প্রলাপ। অনবরত কোমল কোলাহল। গহন গভীর ঘুমের অতল অবলুপ্তি।

সেই সময় দূরে কোথাও ভেসে গেল ধানখেত। ভেঙে পড়ল আমগাছের একটি ডাল। রাতজাগা পাখিরা কঁকিয়ে উঠল কোথাও। সেই সময় একটি প্রান্তরে সমস্ত পৃথিবীর মূর্ছা। বিচলিত আনন্দসম্ভার। বিনিঃশেষ সংশয়িত জীবন। সেই সময় 'একাকী একটি বৃষ্টি-রাতের শব্দের মতো' তাঁর অন্তর থেকে বেরিয়ে এলো অন্তর। সেই সময় হৃদয় থেকে বেরিয়ে এলো হৃদয়। গায়ের ওপরে রাখা চাদর আলতো করে সরিয়ে, চৌকাঠ পেরিয়ে সে মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে, মত্ত হাওয়ার ছন্দে, মেঘে মেঘে বজ্র শিখর ভূজঙ্গ প্রয়াতে।

সেই সময় দূরের মসজিদ থেকে ঘোষিত হলো ভোরের আজান। সেই আজানের প্রতিটি শব্দ অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জের অবিশ্রাম আকুল-ব্যাকুল ক্রন্দনের মতো আছড়ে পড়তে লাগল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, এই প্রিয় মাতৃভূমির যাপিত আচ্ছন্নতার কিনারে কিনারে। সেই ধ্বনিপুঞ্জ শ্বেতশুভ্র মহার্ঘ সিল্কের মতো

তার শরীরে অঙ্কুরিত করল ডানা। আর তিনি এই শহর, গ্রাম, কোলাহল, ঘুম, জাগরণ, আনন্দ, বেদনা পাড়ি দিয়ে; বনের পর বন পেরিয়ে; সমুদ্রের পর সমুদ্রের উন্মাতাল ঢেউ পার হয়ে; পাহাড়ের পর পাহাড়ের দুর্গমতা পাড়ি দিয়ে; এই ভালো লাগা-ভালোবাসার দ্যুলোক, ভূলোক, গ্যালাক্সির পর গ্যালাক্সি পার হয়ে উড়ে চললেন তাঁর সুদূর পারের স্বপ্নসখার উদ্দেশে।

গেরস্ত বাড়ির ভোরের মোরগ চিৎকার করে উঠল—'সবাই উঠো, জাগো। মহামনীষী সৈয়দ আলী আহসান চলে যাচ্ছেন। দ্যাখো কী মহিমান্বিত তার যাত্রা!' কিন্তু মানুষ তখনও ঘুমিয়ে। তারা কেউ কিছু জানতেই পারল না।

দুই

সৈয়দ আলী আহসান। আমাদের মননশীলতার অভ্রংলিহ মিনার, যাঁর সতত সঞ্চারমান সৃজনশীলতা ধারণ করেছিল এই ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের অস্তিত্ব আর স্বপ্ন। মননে-সৃজনে যুগলবন্দি এই মহান মোহনা ছিলেন আন্তর্জাতিক গগনে আমাদের একমাত্র স্পর্ধা। টেকনাফের প্রান্তর থেকে তেঁতুলিয়ার মহানন্দার তীর, বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসমুদ্র, লালন ফকির থেকে জাঁ পল সার্ত্র, কেনজাবুরোওয়ে থেকে নিউপোল্ড সেদর সেংঘর, শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে টেড হিউজ, হাম্বুরাবির কাল থেকে জাতিসংঘ ভবন—সবখানে তিনি ছিলেন। সবখানে ছিল তাঁর আতিথ্য। শত্রু-মিত্র সবার বেলায়ই তিনি অনিবার্য; তাঁকে এড়িয়ে চলবার উপায় নেই।

তিনি কবি। তিনি শব্দের শিল্পী। তিনি শিক্ষাবিদ। তিনি অনন্যসাধারণ শিল্পবোদ্ধা। তিনি ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি গভীরগ্রাহী গবেষক। তিনি পরম দায়িত্বশীল অভিভাবক। সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম কোনো কিছুই তাঁকে ছাড়া আলোকিত হয় না। তিনি সংস্কৃতি বলয়ের সর্বোচ্চ নাম; জাতীয় অধ্যাপক। তিনি মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ছিলেন আমার আশা, আশ্বাস, আশ্রয় ও আবেগ। হাঙ্গরের-কুমিরের ঢেউয়ের বিরুদ্ধে তিনি আমাদের অবিরাম অনুপ্রেরণা। তিনি অবিশ্রান্ত, ক্লান্তিহীন। নিশ্চিন্তে নিঃশঙ্কচিত্তে পেরিয়ে গেছেন নির্মম নিষ্ঠুর চড়াই-উতরাই। তিনি প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। তিনি কিংবদন্তি। তিনি জ্ঞানসমুদ্র। আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন।

জ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় আলোর প্রদীপ হাতে তিনি জন্মেছিলেন যশোরের আলোকদিয়ায়। তিন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলা একাডেমির পরিচালক (মহাপরিচালক), মন্ত্রিত্ব—বহুভাবে দেখেছেন জীবনকে। ঘুরেছেনও বহু। বিশ্বময় তাঁর গুণগ্রাহী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড় শতাধিক; পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার প্রবন্ধ-নিবন্ধ। অপ্রকাশিত আছে আরও। কবিতার জন্য আদমজী পুরস্কার পেয়েছিলেন সেই ৪৭-এ। ৮৩-তে একুশে পদক। ৮৭-তে স্বাধীনতা পদক। বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে সম্মাননা পেয়েছেন ৭৪-এ। ১৯৯২ সালে ফরাসি সরকার তাকে দিয়েছে OFFICER DE LORDIRE

DES ARTS ET DES LETTERS-এর বিরল সনদ। আরও কত সম্মান! কত দেখাদেখি, কত লেখালিখি! জীবনের একটি দিনও যিনি অপচয় করেননি—সেই সৃষ্টিবীর, কর্মবীর সৈয়দ আলী আহসান আর নেই!

২৫ জুলাই সকাল সাড়ে ৬টা। ঝড়ের রাতের রুদ্র-তাণ্ডবে লন্ডভন্ড, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি আর বিনষ্ট শস্যখেতকে সামনে নিয়ে অসহায়, বিপন্ন, বিভ্রান্ত, পরাজিত, পর্যুদস্ত কৃষক যেভাবে বসে থাকে; আমার টেলিফোন সেটটির সামনে সেভাবে পড়ে রইলাম। প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী মাত্র কিছুক্ষণ আগে জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি দিয়েছেন বুলাকে। বুলা আমার স্ত্রী। আমাকে ঘুম থেকে জাগাল। তার চোখ দিয়ে তখন টপটপ করে পানি পড়ছে। বললেন—'স্যার নেই!'

তিন

গতকাল অর্থাৎ ২৪ জুলাই। স্যারের ফোন—'আবদুল হাই, তোমাকে তো পাই না। কীসের এত ব্যস্ততা তোমার!'

আমি লজ্জায় পড়ে যাই।

স্যার বললেন—'তোমার সাথে আমার অনেক জরুরি কথা আছে। আমি একজন ভালো ভাইস চ্যান্সেলর খুঁজছি। তুমি এ ব্যাপারে আমাকে একটু খোঁজখবর দাও তো। তা ছাড়া আমার বইপত্রগুলো নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি করে দিতে হবে তোমাকে। প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হবে সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলতা

দূর করার জন্য বাংলাদেশ সংস্কৃতি একাডেমি জাতীয় কিছু করা দরকার।'

আমি বললাম—'স্যার।'

স্যার আবার বললেন—'শোনো, এখন যে ধর্মমন্ত্রী না প্রতিমন্ত্রী হয়েছে—ছেলেটার নাম কী?'

বললাম—'সম্ভবত আপনি মোশারেফ হোসেন শাহজাহান সাহেবের কথা বলছেন।'

স্যার বললেন—'হ্যাঁ, তা-ই। তা শুনলাম, ছেলেটি নাকি ভালো লেখে। অনেকেই আমাকে বলেছে, উপকূলীয় জীবন নিয়ে ওর নাকি কয়েকটি বই বেরিয়েছে। কিন্তু ও তো কখনো ওর কোনো বই আমাকে দেয়নি। ওকে আমার কথা বলো, বইগুলো পড়তে চাই। পারলে ওকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তো ওর বইয়ের ওপর দু-একটা লাইন লিখেও দিতে পারি।'

বললাম—'নিশ্চয়ই, আমি বলব স্যার।'

স্যার বললেন—'ঠিক আছে। আরও কিছু জরুরি কথা আছে। তুমি কাল সকালে একবার আসো। তখন বলব।'

সেই 'কাল সকাল' ছিল ২৫ তারিখ সকাল। আমার যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল। অফিসে যাওয়ার পথে স্যারের বাসায় যাব, এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু সেই সৌভাগ্য আর আমার হলো না। সেই একই টেলিফোন মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বহন করে আনল স্যারকে। না, স্যারের কণ্ঠ নয়; তাঁর মৃত্যু সংবাদ।

কাঁদবার সময় হয়নি। তখন অনেক কাজ। স্যারের ভক্ত, অনুরক্ত, ছাত্র, শিষ্য, কবি, লেখক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আইনজীবী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠক, মন্ত্রীপাড়া, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে খবর পৌঁছাতে হবে। সংবাদপত্র, বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলগুলোতে জানাতে হবে। খবর পৌঁছাতে হবে *ইনকিলাব* পরিবারের কাছে—যে পরিবারের প্রতিজন সদস্য স্যারকে পিতার মতো জানতেন, যে পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল স্যারের শেষ দিনগুলোর প্রধানতম বাহন।

চার

আধুনিক উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি কলীম সাসারামী ষাটতম জন্মদিনে মনীষী সৈয়দ আলী আহসানের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জনিয়েছিলেন এই বলে :

> যখন বিধাতা সাহিত্যের জন্য একটি উজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দুর কথা ভাবলেন, সৈয়দ আলী আহসান সাহিত্যের দিগন্তে আবির্ভূত হলেন কিরণ সঞ্চারী সূর্যের মতো। এবং তখন কাব্যলোক আনন্দের সারাৎসার এবং উচ্ছলতা-উৎফুল্লে নৃত্যরত হলো। স্বর্গ থেকে ধরিত্রী পর্যন্ত উপদান সংগীতে সমৃদ্ধ হলো।

সেনেগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি লিউপেল্ড সেদর সেংঘর তাকে শ্রদ্ধা জানান এই বলে :

> তুমি এলে।

তোমার চোখ আমার চোখের সামনে
দিয়ে চলে গেল।
তোমার চোখ ঈষদুষ্ণ বাড়ির স্পর্শে
চুম্বকের স্বাদ পেল।

সেই আনন্দপুরুষ, আমাদের জন্য পূর্ণতার কল্যাণ সৈয়দ আলী আহসানের ইন্তেকালের খবর সবাইকে দিই কী করে! তবু বলি, আমাদের জ্ঞানসাধনার আজীবন অতন্দ্র মানুষটি আর নেই।

সৈয়দ আলী আহসানের পুরো জীবন আসলেই এক কল্যাণচিত্র। তিনি যেখানে যখন হাত দিয়েছেন, সেখানেই ফুটে উঠেছে শত-সহস্র পুষ্প। যেখানে তিনি, সেখানেই প্রশান্তি আর প্রসন্নতার নির্মল বাতাসের অনন্ত আদর।

তিনি আদর্শনিষ্ঠার এক মূর্তপ্রতীক। তাঁর সকল কর্মকাণ্ড, সকল ঐকান্তিকতা, সকল শব্দপ্রবাহের অন্তরঙ্গে প্রিয় মাতৃভূমি। আর তাঁর চেতনার আকাশ, সকল অন্বেষণের অন্তরে কেবল নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিনয়। বিশ্বাসের অনির্বচনীয় বিভূতি।

তিনি যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে হাত দিয়েছেন, তখন তার দ্যোতনাই গেছে বদলে। তিনি যখন গবেষণায় রত, তখন তিনি ধ্যান মৌন অচঞ্চল ও নির্ভুল। শিল্প সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের নামের পাশে লেখা যায়, এ রকম আর একটি নাম কেউ শোনাতে পারবে না। তাঁর কবিতা তো শব্দের শিল্প; মৃত, শক্ত কংক্রিটে লাবণ্যের সাড়া; নিরন্তর সৌন্দর্য আর

আনন্দ যাত্রা। তিনি বাংলা ভাষাকে দান করেছেন মনোহারিত্ব। শব্দের শিরায় সন্ধিতে সঞ্চার করেছেন ঐশ্বর্যিক পরিতৃপ্তি। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ অনুকরণীয়, বাচনভঙ্গি স্রোতবাহী নদীর অবিনশ্বর কল্লোল, বাগ্মী হিসেবে তো তিনি তুলনারহিত। আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসে তার মতো এত বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আর কেউ আসে নাই। অনেকে আপত্তি করতে চাইবেন, কিন্তু এ কোনো অতিশয়োক্তি নয়। গভীরভাবে তাকালেই যে কেউ তা অনুধাবন করতে পারবেন।

সার্বিক বিচারেই তিনি ছিলেন আমাদের পথচলার বাতিঘর। সর্বনাশ যখন চারিদিক থেকে ঘন হয়ে এসেছে, দুর্যোগ যখন ব্যাহত করেছে আমাদের উত্থান, তখনও তিনি থেকেছেন অকম্প। চতুর্দিকে যখন কোলাহল আর উত্তেজনা, তখন তিনি থেকেছেন শান্ত। তাঁর আভিজাত্যে কখনো ফাটল ধরাতে পারেনি কেউ। তিনি নিজের ভেতরে একটা মহিমান্বিত নির্জনতা নির্মাণ করে নিয়েছিলেন।

এই নির্জনতাকে চৌচির করার জন্য আমাদের অনেক অকৃতজ্ঞ কবি, অনেক কুষ্মাণ্ড অধ্যাপক অহর্নিশ গলদঘর্ম থেকেছে। তাদের কুরুচিপূর্ণ, নোংরা আক্রমণে আমরা অনেক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়তাম। কিন্তু তিনি আমাদের শোনাতেন অভয়বাণী :

> আমার জীবনে কোন সংশয় নেই। বিশ্বাসের অধিগম্যতা আছে, কিন্তু কোন গোঁড়ামী নেই। আমি যে আমার সমগ্র জীবনে বস্তুবাদ থেকে মানুষের মুক্তির কথা বলেছি, সে কথা সকলে স্বীকার করেছেন। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বর্তমানে খুবই বিপর্যয় চলছে। কিছু কিছু মানুষ নাস্তিক্যবাদে

> অহংকারী হয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিজেদের মতাদর্শে দীক্ষিত করে জড়বাদী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। আমাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার অর্থ হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ ও জড়বাদের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশ্বাসের বলয় আমি নির্মাণ করতে চেয়েছি এবং আমার অনুরাগীরা জানেন যে, আমাকে গ্রহণ করলে সত্যকে গ্রহণ করার পথ উন্মুক্ত হয় এবং বিশ্বাসের প্রতাপ বৃদ্ধি পায়। আমি কবিতাকে বিশ্বাসের বিভূতি বলেছি।
>
> যারা আমার বক্তব্যের সাথে একমত নন, তারা আমার কথায় উত্তেজিত হচ্ছেন এবং আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি কখনো এদের উচ্চকণ্ঠে ভীত হইনি। বরঞ্চ এদের উচ্চকণ্ঠকে ক্ষীণপ্রাণের আর্তনাদ বলে মনে করি।... আমার শত্রুপক্ষীয়রা সর্বদাই দুঃখিত হচ্ছে যে, তাদের আক্রমণে আমি কখনো বিচলিত বোধ করি না। বরঞ্চ আমি বলে থাকি—যারা আমাকে আক্রমণ করেন, তারা সর্বদাই আমাকে স্মরণ করেন। তারা আমাকে মূলত শত্রুরূপে ভজনা করেন। কিন্তু পৃথিবীতে আমার সামনে যতটা সময় আছে, সেগুলোকে আমি পুরোপুরি ব্যবহার করতে চাই এবং ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য একটা দিক-নির্দেশনা দিয়ে যেতে চাই।

নিজেদের গায়ের বস্তা বস্তা আবর্জনার কথা বিবেচনায় না এনে তার কিছু 'ভীষণ প্রকৃতি'র নিন্দুক অহরহ প্রচার করে বেড়ায়—তিনি আইয়ুব খানের *প্রভু নয় বন্ধু*-র অনুবাদক। তাঁর

চরিত্র হননের জন্য তারা প্রচার করে, তিনি এরশাদের 'কবিতা কেন্দ্র'র প্রধান ছিলেন এবং ব্যক্তিজীবনে বিপুল বিত্তের অধিকারী। এই মিথ্যা অভিযোগের কয়েকটি জবাব তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর *আমার সাক্ষ্য* গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :

> আইয়ুবের জীবনীর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন নূরুল মোমেন এবং মুনীর চৌধুরী এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য ও প্রকাশনা পর্যবেক্ষণ করা। অথচ আমিই এই গ্রন্থের অনুবাদক—এই মিথ্যা কথা বহুবার প্রচার করা হয়েছে এবং আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার, এই আইয়ুবের সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ই ছিল না। পরিচয় ছিল শওকত ওসমানের, গোলাম মোস্তফার, মুনীর চৌধুরীর এবং নূরুল মোমেনের। অথচ আমার বন্ধুগণ—যারা আইয়ুবের তাঁবেদারি করে জীবনে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন—তাদের সম্পর্কে একটি শব্দ উচ্চরণ না করে আমাকেই শুধু আহত করার চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্রের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন চারজন—আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন ও সৈয়দ শামসুল হক। দেশে ও দেশের বাইরে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য পরে সৈয়দ আলী আহসানকে নিয়ে আসা হয় এবং তিনি কবিতা কেন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হন। শামসুর রাহমান কবিতা কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*'য় 'কবিতা' বিভাগে নিয়মিত এরশাদ সাহেবের কবিতা

ছাপাতেন। শোনা যায়, তিনি বারিধারায় জমির প্লটও বাগিয়েছিলেন। তারপরও তিনি নির্ভার পানকৌড়ি। যেমন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের দালালি করেও মহামুক্তিযোদ্ধা সেজে বসে আছেন, সেরকম। অথচ এর দায়দায়িত্ব চেপেছিল সৈয়দ আলী আহসানের ওপর। জবাবে তিনি লেখেন :

> এরশাদের সময় দীর্ঘ চার বছর আমার কোন কর্মক্ষেত্র ছিল না। সে সময় কবিতা কেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে আমরা একটি এশিয়ান কবিতা উৎসবের আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই পরিকল্পনার অর্থ সাহায্যের জন্য আমরা রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হই। তার ফলে আমি নতুন করে বিতর্কিত হলাম এবং চিহ্নিত হলাম সরকারি কবি দলের নেতা হিসেবে। আখ্যাটি পেলাম অন্য একটি কবিগোষ্ঠীর হাত থেকে, যারা পশ্চিমবঙ্গের প্রেরণায় এবং সমর্থনে ও ছায়ায় কবিতার মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিল। এদের কাছে আমি বিতর্কিত হলাম এবং এভাবে আমি সততই বিতর্কিত।

নিজের বিত্তবৈভব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

> কেউ বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমার একটিও বাড়ি নেই কিংবা এককণা জমিও নেই। যে বাড়িতে আমি থাকি, সেটি আমার স্ত্রীর বাড়ি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাড়িটি দলিল করে আমার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। দলিলে আমার পক্ষে শুধু এ কথাটুকু লেখা আছে যে, এই বাড়িতে মৃত্যু পর্যন্ত আমার বসবাসের অধিকার থাকবে। আমি একটি

> শোয়ার ঘর পাব এবং একটি বসার ঘর পাব। এ অবস্থাতেই আমি আছি। যে ড্রইংরুমে বসি এবং আমার বইপত্র রয়েছে, সে ঘরটিও জীর্ণ দশায় এবং সে ঘরের আসবাবপত্র চোখ ধাঁধানো নয়। আমার অবস্থা এত বেশি সুস্পষ্ট, যে কেউ একবার চোখ মেলে তাকালে বুঝতে পারবে যে আমি আমার নিজস্ব বেতন-ভাতার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি। এ অবস্থায় বাস করতে আমার কোন প্রকার মানসিক বৈকল্য নেই। আমার শুধু জিজ্ঞাসা—যারা আমাকে কুচক্রী এবং অর্থলোভী বলে মনে করেন, তারা কি নিজেদের চারিত্রিক গুণাবলি আমার ওপর আরোপ করে এসব কথা বলেন? ছলনা এবং মিথ্যাচার যাদের স্বভাব, অপরাধ প্রবণতায় যারা ভয়ঙ্কর, কল্যাণকে অবদমিত করার প্রয়াস যাদের নিরন্তর, তাদের কাছ থেকে ঘৃণায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমি আমার তুচ্ছ সম্পদ নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চাই।

শেষ পর্যন্ত সেই শোবার ঘর ও বসার ঘর তাঁর থাকেনি। তাঁর জীবদ্দশায়ই সেই স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি বিক্রয় করে দেয় ছেলেরা। সার্বিক বিচারেই তিনি গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন। এরপরও কালো মেঘের দল বারবার মলিন করতে চেয়েছে তাঁর 'একক সন্ধ্যার বসন্ত'কে। কিন্তু তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হয়ে বারবার দাঁড়িয়েছে এ দেশের কোটি কোটি জনতা—যাদের কাছে তিনি ছিলেন দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অগ্রনায়ক। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দর্শনের মহান ব্যাখ্যাতা এবং দেশশ্রেষ্ঠ মনীষী।

পাঁচ

আগেই বলেছি, স্যারের সেই বিখ্যাত বাসা—যে বাসায় বারবার কড়া নেড়েছেন দেশি-বিদেশি মনীষীরা, আনন্দে-সংকটে ছুটে গেছেন দেশের সর্বস্তরের সচেতন মানুষ—সেই বাসাটি আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি হয়ে পড়েছিলেন গৃহহীন। শেষ দিনগুলো কাটিয়ে গেছেন তার কন্যা কমর জাবিনের বাসায়।

মৃত্যুর পর সেখানেই ঢল নামে শোকার্ত মানুষের; শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জগতের। ছুটে আসেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান, প্রফেসর এমাজউদ্দীন—কত জনের নাম বলব! এর মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর জসীম জানান—আমাদের প্রিয় শিক্ষককে আমরা তাঁর প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দাফন করতে চাই। স্যারের স্বজন, গুণগ্রাহী সবাই একবাক্যে রাজি। এর চেয়ে ভালো কোনো প্রস্তাব আর হয় না।

স্যারের প্রথম জানাজা হলো বাসার পাশেই। তারপর লাশবাহী গাড়ির সামনে-পেছনে গাড়ির বহর। লাশ এসে পৌঁছল বাংলা একাডেমিতে, তাঁর অনেক কর্মের কলরব যেখানে কান পাতলেই শোনা যায়। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান, সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসাসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সেখানে স্যারের প্রতি নিবেদন করলেন শ্রদ্ধা। কামনা করলেন মাগফিরাত। দ্বিতীয় জানাজা শেষে লাশ নিয়ে যাওয়া হলো দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এর আগেই প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, স্যারের অনুরাগী জনাব মোসাদ্দেক আলী জানিয়েছেন—প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই মহাপুরুষের ইন্তেকালে গভীরভাবে শোকাভিভূত। তিনি ইতোমধ্যেই পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর লাশ দাফনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। সবাইকে এই সংবাদ জানানোর জন্য তখনই তৎপর হয়ে পড়লাম শিল্পপতি আবুল কাশেম হায়দার, কবি আসাদ বিন হাফিজ ও আমি। এই ঘোষণার কথা শুনে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে বিচরণশীল প্রতিজন মানুষ দারুণভাবে আপ্লুত হলেন।

আসরের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হলো স্যারের তৃতীয় জানাজা। শত শত মানুষের শোকার্ত পদক্ষেপে ভারাক্রান্ত সেদিনের জমায়েত। জানাজায় অংশ নিতে ছুটে এসেছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ, শিক্ষাবিদ, উলামা মাশায়েখ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নবীন-প্রবীণ কবি, লেখক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

জানাজার পর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে স্যারের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রাজনৈতিক সচিব মোসাদ্দেক আলী। সরকারিভাবে লাশ গ্রহণ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক। তার নেতৃত্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে গেল লাশবাহী গাড়ির বিশাল বহর। ঢাকার কর্ম-কোলাহল দুপাশে সরাতে সরাতে এগিয়ে চললাম জাহাঙ্গীরনগরের সবুজ শ্যামল মেধাবী

নির্জনতার দিকে। সেখানে তীব্র শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য সুদূর সাইবেরিয়া থেকে ঝাঁকবেঁধে উড়ে আসে অতিথি পাখিরা।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসার গাড়িতে যাচ্ছি আমরা। কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা, কবি ইশারফ হোসেন এবং আমি। ইশারফ কথা বলে যাচ্ছেন। স্যারকে নিয়ে কী করা যায়, কী করা উচিত—এসব ভাবছি সবাই। স্যারের রচনাবলি, পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য জীবনী, স্যারের নামে সড়ক, ছাত্রাবাস, মিলনায়তন, পাঠাগার এসব করতে হবে এবং তা দ্রুততার সঙ্গে। পাশাপাশি শোকের এই সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির লোকজনদের একত্রিত করে একটা ইতিবাচক প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় কি না, ভাবছি সেটাও।

আমার মন চলে গেছে তখন রাশিয়ার সেই নাম-গোত্রহীন রেল স্টেশনে, যেখানে টলস্টয়কে পাওয়া গিয়েছিল মৃত অবস্থায়। মিহাই এমিনেস্কুর লাশ আবিষ্কৃত হয়েছিল বুখারেস্টের বেওয়ারিশ মর্গে। ফেডরিকো লোরকার রক্তের ধারা হারিয়ে গেছে আন্দালুসিয়ার অন্ধকারে। মায়াকোভস্কি আত্মহত্যা করে স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা জুড়িয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা জহির রায়হানের লাশটাও খুঁজে পায়নি বাংলাদেশের মানুষ। কোথায় মুনীর চৌধুরী, আলতাফ মাহমুদ? সময়ের অগ্রবর্তী রাষ্ট্রনায়ক মোহাম্মদ বিন তুঘলককে মানুষ পাগল বলে গালি দিয়েছিল। হেমলকের পাত্র তুলে ধরা হয়েছিল জ্ঞানপুরুষ সক্রেটিসের মুখে। মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিওর জন্য ঘোষিত হয়েছিল প্রাণদণ্ড। নবাব সিরাজদ্দৌলার দলিত-মথিত লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছিল

বাজারের ময়লা ফেলার স্তূপের মধ্যে। আর বাংলাদেশকে যিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন, স্বাধীনতার সেই মহান ঘোষক শহীদ জিয়ার বুক ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল মেশিনগানের বুলেটে। তারপরও তাঁরা ছিলেন সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠ-অবিচল, যেমন ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান।

গাড়ি যাচ্ছে সাভারের পথে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর ওপর থেকে সূর্য গুটিয়ে নিচ্ছে তার আলোক বিচ্ছুরণ। নেমে আসছে প্রাচীন আদিম বোবা অন্ধকার। আজ থেকে ১৫২ বছর আগে এমনই এক আগস্ট মাসে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে সুদূর ফ্রান্সে মহান বালজাকের লাশ নিয়ে বেরিয়েছিল শেষ যাত্রার মিছিল। শ'খানেক লোক অংশ নিয়েছিল সেই অন্তিম যাত্রায়। সম্মুখভাগে ছিলেন ভিক্টর হুগো, আলেকজান্দার দুমা, স্যাৎ ব্যুভ। ছিলেন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের মন্ত্রী মাঁসিয়ে বারোশ। বারোশ ছিলেন বিরক্ত ও গম্ভীর। হুগোর পাশ দিয়ে এগোতে এগোতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যালো মিস্টার, এই বালজাক লোকটি কে? চিনিনে জানিনে অথচ সরকার থেকে হুকুম এলো—যাও, তার শবযাত্রায় সঙ্গী হওগে।'

শুনে ভীষণ রেগে গেলেন হুগো। ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট বেঁকে গেল। মূর্খ রাজনীতিকটির দিকে দু-পলক তাকিয়ে তিনি চাপা কণ্ঠে জবাব দিলেন—'বালজাক ছিলেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।'

প্যের লাশইজের পাহাড় চূড়ায় যখন বালজাকের লাশ এসে পৌঁছাল, তখন অঝোরধারায় নেমেছে বৃষ্টি। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ বইতে শুরু করেছে বাতাসে। যেন প্রিয়তম পুত্রকে হারিয়ে

ফরাসি ভূমি আকুল হয়ে কাঁদছে। কবরের পাশে নামানো হলো বালজাকের কফিন। সকলের পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দাঁড়ালেন সিক্ত, অশ্রুরুদ্ধ ভিক্টর হুগো :

> মঁসিয়ে বালজাক ছিলেন শ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উৎকৃষ্টদের মধ্যে শীর্ষতম। তার সব বই মিলিয়ে একটাই বই—উজ্জ্বল জীবন্ত অগাধ। উত্থান-পতন চঞ্চল আমাদের স্বকালীন সভ্যতার চলচ্চিত্র চিরকালের মত বিধৃত হয়ে গেছে তাঁর মধ্যে। আমাদের আনন্দ-বেদনা, ভয়-ভালোবাসা, ক্ষোভ-ঘৃণা সব, সমস্ত ওতপ্রোত হয়ে গেছে তার কাহিনীর কুশীলবদের সঙ্গে। বালজাক তার সমগ্র রচনার একটাই নামকরণ করেছেন—'হিউম্যান কমেডি'। কিন্তু আমার তাকে বলতে ইচ্ছা করে 'হিউম্যান হিস্ট্রি'। যে সৃষ্টি বিষয়ে, বিন্যাসে, শৈলীতে অতীত ও বর্তমানকে অতিক্রম করে দূর ভবিষ্যতকেও স্পর্শ করতে পারে; তারই গৌরবে আমরা অতঃপর চিরকাল গর্ব করব।

বৃষ্টির ধারা আর ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় বারবার ভেঙে পড়ছিল হুগোর বিষণ্ন গম্ভীর কণ্ঠস্বর। আর বিষাদ-বিরস কতগুলো মানুষ ছিলেন নতশিরে দাঁড়িয়ে। হুগো বলেছিলেন—'আজ থেকে আর মানুষ রাজা-মহারাজাদের দিকে ফিরে তাকাবে না। তাঁরা মনীষীদের মুখ দেখতে চাইবে এবং যখন তার মতন একজন মনীষী আমাদের মধ্য থেকে চলে যাবেন; তারা শিউরে উঠবে, কেঁদে ফেলবে—যেমন করে কাঁদছি আজ আমরা বালজাকের জন্য।'

বাদল বাতাসে এলোমেলো হয়ে ভেসে আসতে থাকে ভিক্টর হুগোর বাণী :

> আমরা, গোটা প্যারী শহর আজ বালজাকের মৃত্যুতে বিপন্ন-বিভ্রান্ত বোধ করছি। এই কঠোরশ্রমী শিল্পী; এই দার্শনিক, ভাবুক, কবি; এই অবিনশ্বর প্রতিভা আমাদের মধ্য থেকে সারা জীবন দুর্দিনের ঝড়ে মার খেয়েছেন, সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন দূরদৃষ্টের সঙ্গে। আসলে এটা সব প্রতিভাবানেরই ভাগ্য। এই কষ্ট কপালে করেই তারা পৃথিবীতে আসেন। সেই কষ্ট ও সংগ্রামের শেষে আজ বালজাক শান্তিতে শয়ান। আজ তিনি সকল বিরোধ, বিদ্বেষ ও যন্ত্রণার অতীত। আজ তিনি সমাধিতে প্রবেশ করেছেন; কিন্তু সমাধির সমাপ্তিতে নয়, সে অন্ধকারে নশ্বর দেহ রেখে তিনি খ্যাতির চির আলোচিত জগতে অবিনশ্বর হয়ে গেছেন। এখন থেকে আমাদের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের একটি হয়ে তিনি অনন্তকাল আলো দিতে থাকবেন।...

আর হঠাৎ আমার মনে হলো—কী সৌভাগ্যবান এই মহাপুরুষ! সকল মানুষের ভালোবাসা ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন। পথের দুপাশে মানুষ। শহর, জনপদ, গ্রাম-প্রান্তর পাড়ি দিয়ে তিনি চলেছেন ছায়াঘন শ্যাম নয়নাভিরাম জাহাঙ্গীরনগরের পথে। তাঁর শেষের চলার পথে। এবং কী অদ্ভুত ব্যাপার—জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঘুমিয়ে রইলেন তার স্বপ্নের মসজিদের পাশে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তিনি চলেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে, মসজিদের পাশেই।

সেদিন যদি আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকত, তাহলে কী দুর্গতিই না হতো আমাদের সকলের! কষ্ট আর লজ্জার শেষ থাকত না আমাদের। না, সকল প্রকার গ্লানি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন প্রতিপালক। নইলে হয়তো বারোশের মতো মূর্খরা বলে বসত—'কে এই সৈয়দ আলী আহসান? কীসের সৈয়দ আলী আহসান?' যেমনটি করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা মনীষী আহমদ ছফা সম্পর্কে। যেরকমভাবে তাদের নির্মম উপেক্ষা এবং অশিক্ষায় জর্জরিত হয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ!

সাত

আকাশ-মাটি অন্ধকারে ধূসর হয়ে গেছে। মাগরিবের আজান ধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। আর আমরা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ মানবকে নিয়ে প্রবেশ করছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ততক্ষণে ক্যাম্পাসে ঢল নেমেছে শোকার্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। স্যারের লাশের পাশে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহমদ বলছেন—'স্যারের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। আমরাও স্যারকে ভালোবাসতাম সবার চেয়ে বেশি। সেই প্রিয় মানুষটিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে ধারণ করে আজ আমরা সত্যিকার অর্থেই গৌরবান্বিত হলাম।'

প্রো-ভিসি প্রফেসর ইমাম উদ্দিনসহ সবাই ব্যস্ত স্যারের শেষ শয্যাকে ত্রুটিমুক্ত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায়। নামাজের পর

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ অঙ্গনের অন্ধকার দূর করার জন্য কয়েকটি গাড়ির হেড লাইট জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। দুদিকে সারিবেঁধে দণ্ডায়মান পুলিশ। বেষ্টনীর বাইরে ছাত্র-শিক্ষক-জনতা। মাঝখান দিয়ে জাতীয় পতাকায় আবৃত স্যারের লাশ কাঁধে করে নিয়ে এলাম আমরা। লাশ ঘিরে শেষ অভিবাদন 'গার্ড অব অনার' জানানোর জন্য দাঁড়াল পুলিশের একটি চৌকশ দল। স্যারের শিয়রের কাছে শ্রদ্ধাবনত শিরে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, ভিসি প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহমদ, পুলিশের মহাপরিদর্শক মুদাব্বির হোসেন চৌধুরী, স্যারের কনিষ্ঠপুত্র সৈয়দ আলী উল আমীন, জামাতা ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী।

করুণ সুরে বেজে উঠে বিউগল। সে তো বাজনা নয়, যেন হাজার-লক্ষ-কোটি মানুষের শোকার্ত হৃদয়ের অব্যক্ত গোঙানি। যেন সর্বস্ব হারানো মর্সিয়ার কান্না। বাতাসে সেই দলিত বেদনা মোচড় খেয়ে খেয়ে ফিরতে থাকে। স্তব্ধ অচল-স্থবির অন্ধকারে সেই অসহ্য হাহাকার আরও অধিক নিকষ কালো মেঘে আঁধার করে ফেলে আকাশকে। একসময় থেমে যায় বিউগল। কিন্তু বাতাসে রেশ রয়ে যায় আর্তনাদের। নিশ্চল নিশ্চুপ মানুষগুলো এবার নড়ে ওঠে।

পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের আদর্শ ও পন্থায় লাশ নামানো হয় কবরে। শিয়রে মূহ্যমান নিমগাছ। ইমাম সাহেব উচ্চকণ্ঠে বলে যাচ্ছেন—'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা করো আমাদের—জীবিত ও মৃতদের, উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের, নারী ও পুরুষ এবং ছোটো

ও বড়োদের। মিনহা খালাকনাকুম, ওয়া ফিহা নুয়িদুকুম, ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা...’

আমরা ছড়িয়ে দিতে থাকলাম মুঠি মুঠি অশ্রুভেজা মাটি। ধীরে ধীরে মাতৃভূমির প্রিয় পবিত্র মাটির আড়ালে হারিয়ে গেলেন কবিদের কবি, শিক্ষকদের শিক্ষক, জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, মনীষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনীষী, আমৃত্যু জীবনপিপাসু, মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত, আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ মানুষ সৈয়দ আলী আহসান।

আট

অথই অন্ধকারের কোনো কূলকিনারা নেই। দিশাহীন, ভাষাহীন সেই অন্ধকারে অসহায়ের মতো সাঁতরাতে সাঁতরাতে আমরা জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাস ত্যাগ করে ফিরতে থাকি। ফিরতে থাকি সেই পথ দিয়ে; যে পথ দিয়ে কিছুক্ষণ আগে তিনি চলে গেছেন, মিশে গেছেন অস্তপারের সন্ধ্যাতারায়। যেখান থেকে কেউ কোনো দিন আর ফিরে আসে না। ফিরতে থাকি অভিমান ভরা বুক নিয়ে। কার ওপর অভিমান, কীসের অভিমান তাও জানি না? সামনে কোথাও কোনো বাতিঘর দেখি না।

পেছনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাটির আড়ালে শুয়ে রইলেন আমাদের আলোর প্রদীপ। আর আমরা এগিয়ে যাচ্ছি শূন্যতার দিকে। অসামান্য অতীত থেকে সামান্যতার দিকে। আমার বুকটা হুহু করতে থাকে হঠাৎ। আশ্চর্য, তিনি আর কোনো দিন ফিরে আসবেন না। এ পৃথিবী তাকে আর কোনো দিন পাবে না। জীবন এত ছোটো কেন! আমার এই

চোখজোড়া দিয়ে তাকে আর কোনো দিন দেখতে পাব না আমি!

গাড়ি চলছে ঢাকার দিকে। আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে পড়ছে পানি। আমার কানের কাছে মক্ষিকার গুঞ্জরনের মতো ক্রমাগত বাজতে থাকে, অনেক রাতে গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো বাজতে থাকে—'মিনহা খালাকনাকুম...এই মাটি থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। সেই মাটিতেই তোমাকে ফিরিয়ে আনা হলো। আবার এই মাটি থেকেই আমি তোমাদের পুনরুত্থিত করব।'